সহোদরা

শুভ্রা সান্যাল

অফিসে যাবার আগে সৌমী বলল,

—মা, আজকে মাসী আসবে না? সকালবেলাতেই আসবে?

—হ্যাঁ সেইরকমই তো জানিয়েছে। বলেছে, এখানে এসে ভাত খাবে। আশা করি রূপ বাড়ি ফেরার আগে আমি চলে আসতে পারব। অথবা যোগাযোগ করে একসাথেই ফিরব।

আমি এর উত্তরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি; কিছুই বলতে পারি না। নিজের মায়ের পেটের বোন আর মাত্র ছয় মাসের পুরোনো পুত্রবধূর কথা, দুয়ের মাঝখানে আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। সৌমী বেরিয়ে যাবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রুনু, আমার ছোট বোন রনিতা এল ওর স্বভাবসুলভ হইহই করে, পাড়া জানিয়ে, নিজের উপস্থিতির জানান দিয়ে। ইলিশ মাছ আর ইলিশমাছের মুড়ো দিয়ে কচুর শাক রান্না করে নিয়ে এসেছে। আমি ওকে আসতে বলিওনি, নিজের থেকেই ফোন করে বলেছিল আসবে। ওর এইসব লোক দেখানো আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। দিদির বাড়ি আসতেই পারে, তবুও।

—এত কিছু রান্না করে আনতে গেলি কেন?

—তুই খাবি, অনন্তদা খাবে, তোর ছেলে-বউ খাবে। তাই।

সৌমীদের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল,

—হ্যাঁরে দিদি, তোর বউমা কি তোকে সন্দেহ করে?

—কেন?

—না, ঘরের মধ্যে ঘর, বাড়িতে শাশুড়ি সব সময় থাকে, তা-ও অফিসে বেরোবার সময় তালা দিয়ে যায়! রোজই যায় নাকি আজই...

—ভালোই তো হয়। আমার দায়িত্ব কমে যায়। নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। চা খাবি না সরবৎ করে দেব?

—সরবৎই খাওয়া, যা গরম!

রুনু আসার আগেই ভেবেছিলাম স্নানটা সেরে নেব। কিন্তু সেটা হল না, ও এসে গেছে। বাধ্য হয়েই বলতে হল,

—তুই একটু বোস। ম্যাগাজিনগুলোর পাতা ওল্টা। আমি স্নানটা সেরে আসি।

—আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। তুই যা। তাড়াতাড়ি করিস।

বেশি সময় লাগেনি, স্নান সেরে বেরিয়ে রুনুর গলা পেলাম পাশের বাড়ি থেকে, গৌতমের মায়ের সাথে গল্প করছে, ওর নাতি দুটোর সাথে হই-হই করছে।

সেদিন রুনু রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। আমার সাথে সারা দুপুর বকর বকর করছে। মানে আমি তো অত পারি না, ওই সারা মাঠ জুড়ে খেলে গেছে। তারপর সন্ধ্যেবেলা ওর অনন্তদার সাথে খানিক আড্ডা মেরে বাড়ি গেছে। তখন পর্যন্ত সৌমী আর রূপ বাড়ি ফেরেনি।

—দিদি, তোর কর্পোরেট ছেলে আর বউমার সাথে তো দেখা হল না। আজ চলি। ওদের একদিন পাঠিয়ে দিস। তোদের দুজনের তো পায়া ভারী, তাই তোদের বলে আর মুখ নষ্ট করছি না।

—না রে, যাব একদিন। সারাদিন বেশ কাটল। তুইও শ্যামল, টুকুনকে নিয়ে আবার আসিস। পরদিন সকালে অনন্ত জিজ্ঞেস করল,

—তুমি কাল ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়েছ তো? পাশবই আপডেট হয়েছে। এমাসেই একটা এল.আই.সির প্রিয়িয়াম জমা দিতে হবে।

—ওহো, না গো। কাল রুনু এসেছিল তো তাই যেতে পারিনি। আজ ঠিক যাব।

—ঠিক আছে। আমাকে দাও, অফিস যাবার আগে জমা দিয়ে যাব।

—আলমারিতে দেখ, সামনে পাশবইটা আছে আর ওর মধ্যেই টাকাটা আছে।

—এ কী! এখানে তো মাত্র দু-হাজার আছে। বাকী টাকা কোথায় রেখেছ?

—কী? দু-হাজার আছে! তুমি যা দিয়েছিলে ওখানেই আছে। ভালো করে দ্যাখ, একসাথে তো পুরো দশহাজারই ওখানে রেখেছিলাম।

—ধ্যাৎ। খালি একশ টাকার নোটগুলো আছে। হাজার টাকার আটটা নোট কোথায় রেখেছ?

—একসাথেই তো রেখেছিলাম।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও টাকাটার হদিশ পাওয়া গেল না। আশ্চর্য, কোনও ম্যাজিশিয়ন ভ্যানিস করে দিল! ক'দিন আমি শুধু খুঁজেই চলেছি। সৌমী বলল,

—ও টাকা কি আর বাড়িতে আছে যে তুমি পাবে?

বাইরের লোক কেউ আসেনি, কাজের লোক বহুদিনের পুরোনো এবং বিশ্বস্ত। তাছাড়া কে জানবে আলমারিতে

পাশবই-এর মধ্যে টাকা আছে। অবশ্য এর আগেও আমার বেশ কিছু টাকা খুব নিরাপদ জায়গা থেকে উধাও হয়ে গেছে।

তারপর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে রুনু আসেনি। আমি তো ওর বাড়িতে যাই-ই-না, মাঝে মাঝে ফোন করলে রিং হয়ে যায়। কেউ ধরে না। এক-একবার হয়তো খুব সামান্য কথা হয়েছে। শব্দহীন পদচারণে আমার অনন্তর বয়স বেড়েছে। শরীরে প্রেসার, সুগার, বাত প্রভাব বিস্তার করেছে। আড়াই বছরের নাতিকে নিয়ে আমার কোলাহলের সংসারের রুনু এলো কী এলে না মনেও থাকে না।

সেদিন সন্ধে ছ'টা নাগাদ ফোনটা বেজে উঠল।

—বালিগঞ্জ থানা থেকে বলছি, মিসেস অনিতা চ্যাটার্জির সাথে কথা বলতে পারি?

আমি কী বলব! গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, হাত-পা কাঁপছে, মাথা ঝিমঝিম করছে—কী হল রে বাবা। থানা থেকে ফোন করছে কেন? ছেলে-বৌমা তো বাইরে। নিশ্চয় ওদের কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে; বেঁচে আছে তো! নিমেষের মধ্যে কত খারাপ খারাপ চিন্তা, ভয়ঙ্কর - ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। অতিকষ্টে বললাম,

—বলছি

—আপমাকে একবার এই থানায় আসতে হবে। বিশেষ দরকার।

—কার কী হয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট? রুপময় চ্যাটার্জি সৌমী চ্যাটার্জি, তিরিশ বছর বয়স, আমার ছেলে-বউমা ওদের কিছু হয়েছে। বেঁচে আছে তো?

আমার বিকৃত স্বরের হাঁউমাঁউ চিৎকারে অনন্ত ছুটে এসেছে। ও হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে কথা বলছে।

—দ্যাখো, থানা থেকে যখন ডাকছে যেতেই হবে। তবে রূপ-সৌমী নয়। নাম বলল রনিতা সরকার।

—অ্যাঁ! রুনু! ওর আবার কী হল! উঃ ভগবান!

অনন্ত ছেলে-বউমাকে ফোন করে জানাল, তারপর বাধ্য হয়ে নাতিকে নিয়ে একা ট্যাক্সি করে বরানগর থেকে বালিগঞ্জের দিকে ছুটলাম। আমার দুরন্ত দাদুভাই কী বুঝছে কে জানে, চুপ করে বসে রাস্তা দেখছে। পুলিশ ও ঘটনা সম্বন্ধে ভয়মিশ্রিত আশঙ্কায় আমিও শক্ত কাঠ হয়ে বসে আছি। অনন্ত সিগারেট খাওয়া বেশ কমিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন বেশ ঘন ঘন খাচ্ছে। থানায় পৌঁছবার পরে যে অফিসারটি আমাদের সঙ্গে কথা বলল সে রূপের বয়সীই হবে, ব্যবহারটাও ভালো। পুলিশ বলেত যে ধারণা বা ভয় ছিল ততটা লাগল না।

—আচ্ছা, এই ফটোটা দেখুন তো। এর মধ্যে কাউকে চিনতে পারেন?

—হ্যাঁ। এটা তো আমাদের পারিবারিক ছবি। আপনার কাছে এলো কীভাবে?

—পারিবারিক ফটো! কে কে আছে এর মধ্যে? রনিতা সরকার আছে?

—হ্যাঁ। এই তো। আমার ছোট বোন রুনু—রনিতা, আমি অনেক দিন আগে তোলা তো তাই আপনার চিনতে অসুবিধা হচ্ছে। আমার মা, বাবা, কাকা, কাকিমা, খুড়তুতো ভাই, ঠাকুমা।

—আর এই ফটোটা?

—এটা তো রুনুর পরিবারের ছবি—ওর স্বামী শ্যামল সরকার আর ছেলে টুকুন।

—স্বামী! আই সি।

—কী হয়েছে অফিসার একটু খুলে বলুন। আমরা তো আর টেনশন সহ্য করতে পারছি না। অনন্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছে, আমার অবস্থাও তথৈবচ।

ইতিমধ্যে রূপ আর সৌমী চলে এসেছে। থানার পরিবেশ শিশুদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় বলে সৌমী ছেলেকে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। রূপ আছে।

—দেখুন ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক। সামনে একটা পার্ক আছে। সেখান থেকে চারটে নাগাদ কতগুলো বাচ্চা ছেলে হাতে বল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, পার্কের বেঞ্চে একটা মেয়ে কেমন করে পড়ে আছে। আমি নিজেই গিয়েছিলাম, দেখি একজন মহিলা কিছুটা ঝুলন্ত অবস্থায়, মানে পা-টা বেঞ্চের উপরেই ছিল, মাথাটা একটু ঝুলে আছে। গালের পাশে শুকনো বমির দাগ তাতে মাছি উড়ছে। একটা ছোট লেডিস ব্যাগ বুকের উপর হাত দিয়ে ধরা ছিল, সেই ব্যাগটাতে এই ফটো দুটো ছিল আর একটা ছোট ডায়রি। তাতে দু'টো নাম লেখা; প্রথমেই রনিতা সরকার, তারপর একটা পাতা ছেড়ে অনীতা চ্যাটার্জি, একটা ফোন নম্বর আর দিদি লিখে কেটে দেওয়া আছে। সেই সূত্র ধরেই আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আচ্ছা আপনি বললেন ওঁর স্বামী, ছেলে আছে, তাহলে ওদের ঠিকানা আর ফোন নম্বর বলুন। আর উনি থাকতেন কোথায়? স্বামীর সঙ্গেই কি?

—হ্যাঁ। স্বামীর সঙ্গে থাকবে না তো কোথায় থাকবে?

অনন্ত শ্যামলের ফোন নম্বর ও ঠিকানা লিখে দিল।

—আচ্ছা ওদের বিয়ে কীভাবে হয়েছিল। আই মিন অ্যারেঞ্জড মারেজ না লাভ ম্যারেজ?

—ওরা নিজেরাই দেখেশুনে বিয়ে করেছিল। তবে শ্যামল ছেলেটি বেশ ভালো, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে কাজ করে।

আধঘন্টা পরে আমাদের মতো অবাক আর উদ্বিগ্ন হয়ে শ্যামলও থানায় এসে গেল। আমাদের দেখে একদম চমকে গেল। সব বৃত্তান্ত শুনে মাথা নিচু করে বসেছিল একটু সময়। পুলিশের জেরার মুখে ওর কাছ থেকে জানা গেল যে গত দু' বছর রুনু বাড়ি থেকে চলে গেছে। ডিভোস' এখনও হয়নি।

আমি হাঁ করে শ্যামেলর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কিছুই জানি না।

—আমরা নিজেরাই দেখে শুনে বিয়ে করেছি। প্রথম দিকে খুবই ভালো ছিলাম কারণ রনিতার মতো প্রাণবন্ত মেয়ের সান্নিধ্যে কোনও দুঃখ হতাশা বাসা বাঁধতে পারে না। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই ওর চাহিদা বাড়তে শুরু করল—এটা চাই, ওটা চাই, অমুকের মতো শাড়ি, তমুকের মতো গয়না, ঘড়ি। আমি সাধারণ কেরানি, অত আব্দার মেটাবার সাধ্য আমার ছিল না। ততদিনে ছেলে হয়েছে। সংসারের খরচও বেড়েছে। শুরু হল অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি।

—একটা কথা। আপনারা কি একাই থাকতেন না আপনার বাবা-মা...

—না, বিয়ের দু' বছর পরে রনিতার চাপেই আমি আলাদা থাকি। একসময় লক্ষ্য করলাম আগে যেসব জিনিসগুলো ও আমার কাছে বায়না করত, না পেলে ঝগড়া করত সেইগুলো ও নিজেই কোথা থেকে যোগাড় করছে।

—আপনি জানতে চাইতেন না কোথায় পাচ্ছে এসব?

—অবশ্যই। স্মার্টলি বলল, সোনাদি দিয়েছে, রীনা-বউদি দিয়েছে, অথবা ইনস্টলমেন্টে কিনেছি। পরে ওর আরেকটি গুণের পরিচয় পেলাম— অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারত, মুখের কোনও বিকৃতি ছিল না, একবারও তোতলাতো না। বেশি জেরা করলে বুঝতে পারতাম দশটা মিথ্যেকে ঢাকতে কুড়িটা মিথ্যে দিয়ে মাকড়সার মতো জাল বুনে যেত। আমার বিরক্ত লাগত ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছিল।

—ছেলের প্রতি টান বা ব্যবহার?

—না। ছেলেটা কী করে যেন আমার মতোই সাদাসিধে হয়েছিল। ও বেশি কিছু চাইত না, যেটুকু আবদার ছিল আমি মেটাতে পারতাম। রণিতা আত্মসুখসর্বস্ব, নিজের ভোগের জন্যই ব্যস্ত থাকত। ও যে চুরি করত সেটা বুঝতে আমার খুব বেশি দিন লাগেনি কিন্তু কোনওভাবেই ওকে স্বীকার করাতে পারতাম না। আমি শুধু অফিস আর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এড়িয়ে চলতাম। দু'টো ঘটনা মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছিল। আমার এক মাসতুতো দিদি আর প্রায় বাল্যবন্ধু অসীম যাদের বাড়িতে যাওয়া বা যোগাযোগ রাখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু ও যেত। একসময় ওদের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ওরা আমাকে ডেকে যা তা করে অপমান করেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে চূড়ান্ত অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি, তাসের পিঠে তাসের মতো আমার অভিযোগগুলোকে মিথ্যে কথায় ঢেকে দেওয়া। ছেলেটা ততদিনে হস্টেলে পড়তে চলে গেছে। একই বাড়িতে চুম্বক আর কাঠের টুকরোর মতো স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থান। তারপর নিজেই একদিন বলল, ওর কোন বান্ধবী ওকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ও সেখানেই থাকবে। আমি জানতে চাইনি, আটকাবার চেষ্টাও করিনি।

—আচ্ছা আপনার কি মনে হয়নি, এটা হয়তো কোনও মানসিক বিকৃতির জন্য করছে, ডাক্তার দেখাই।

—হ্যাঁ, মনে হয়েছিল। ওর এই পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হত, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগও করেছিলাম, লাভ হয়নি। ও তো ক্লেপটোম্যানিয়্যাক নয়, লোভী।

হায় ভগবান! এত কান্ড কিছুই জানতাম না।

অফিসার বললেন,

—আমার সাথে আসুন, বডি সনাক্ত করবেন।

সনাক্ত করার আর কী আছে! নিথর রুনু, অপরাধী রুনু। ময়না তদন্তের পর জানা যাবে হত্যা না আত্মহত্যা।

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে অনন্ত বলল,—একটা জীবনে কত কী দেখতে হয়! আমাদের বিয়ের সময় রুনু বোধহয় পনের, ষোল বছরের ছিল না?

আমি চুপ করে বসেছিলাম। আমরা দু'জন এক পাখির দুটো পালক। রুনু আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট। স্বভাবে আমরা দু'জনে সমান্তরাল সরলরেখার মতো চলেছি। কোনওদিকে মিল নেই– আমি শান্ত, বেশি লোকের সামনে গুটিয়ে যাই আর ও যেখানে যাবে নিজের উপস্থিতি সবাইকে জানিয়ে দেবে। মুখে এত আদিখ্যেতা দেখাবে যে সবাই ওকেই বেশি ভালবাসত। ছোট্টবেলা থেকেই ভাল থাকব, ভালো খাব, ভালো পরব। মা-বাবাও ওকে ভয় পেত; সাধ্যের বাইরে গিয়েও ওর আব্দার মেটাত। আমি কি ওকে ঈর্ষা করতাম? আজ মা-বাবা নেই। আমার মৃত্যুমিছিলে আর একটা মুখ যোগ হল। রূপ আমার হাতটা ধরে বলল, –মা, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মাসী অনেক বছর ধরেই ম্যাজিসিয়ানদের মতো হাত-সাফাই করত। আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। সৌমী তো বিয়ের পরদিনই বুঝে গিয়েছিল। ওর অনেক জিনিস বিশেষ করে কিছু সোনার গয়না, টাকা বিয়ের সময়তেই মিসিং হয়ে গিয়েছিল। আমাকে বলেছিল তুমি কষ্ট পাবে বলে তোমাকে বলিনি, সৌমীকেও কিছু জানাতে বারণ করেছিলাম। কী বলব আমি! আমিও তো অনেক দিন ধরে বুঝেছিলাম, ঠকেছিলাম, শেষ তো পাশবইয়ের ভেতর থেকেই টাকাটা উড়ে গেল। সন্দেহ - সিদ্ধান্ত কোনওটাই প্রকাশ করতে পারিনি। আমরা যে সহোদরা